‘মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ : ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও কলম্বিয়ার অভিজ্ঞতা

ফিলিপাইনে গরিবের বিরুদ্ধে ‘মাদক যুদ্ধ’

“এখনও কিভাবে মাদকদ্রব্য দেশের মধ্যে ঢুকছে? কর্তৃপক্ষ ডালপালা কাটছে কিন্তু শেকড় বা কাণ্ডে হাত দিচ্ছে না। সুতরাং গাছটা তো থেকেই যাচ্ছে।”–মারিলো বাতুকান, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় খুন হওয়া ৮ বছর বয়সী সান নিনোর মা।

পুলিশ ও অজানা সশস্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের বেশির ভাগই সমাজের দরিদ্রতম অংশের মানুষ। পুলিশ আবার প্রায়ই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে পরিবারগুলোর কাছ থেকে সম্পদ চুরি করে এবং ফিউনারেল হোম বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে মৃতের পরিবারের খরচ বাড়িয়ে তোলে, যাদের অনেক সময় মৃতদেহ ফিরে পেতে বাড়তি অর্থ খরচ করতে হয়। স্থানীয় মানবাধিকারকর্মীরা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট দুতার্তের মাদকবিরোধী অভিযানের জনপ্রিয়তা হ্রাসের যদি কোন কারণ থাকে তা হল, মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করছে–এই অভিযানের ফলে খুদে মাদক ব্যবহারকারী ও বিক্রেতারা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বড় বড় ড্রাগ লর্ড বা মাদকপ্রভু ও চোরাচালানকারীরা ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না।

মাদক সম্পর্কিত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ফিলিপাইনের দরিদ্রতম শহুরে এলাকার অধিবাসী। ৫০টি মাদক সম্পর্কিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পর্যালোচনা করে এবিএস-সিবিএন দেখেছে, ‘প্রায় সকল নিহত ব্যক্তিই দরিদ্র শ্রেণির’ এবং ‘বস্তি ও শহরতলিতে বসবাসকারী’। এই মৃত্যুর কারণে পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থা আরও করুণ হয় এবং মৃতের আত্মীয়স্বজনের ক্ষোভ বাড়ে, কারণ তারা দেখছে কর্তৃপক্ষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্রেরই টার্গেট করছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যেসব পরিবারের কাছে গেছে তাদের অনেকেই ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকার ছাপরাঘরে থাকে। বেশ কিছু পরিবারের পক্ষে এমনকি মোবাইল ফোন ব্যবহার পর্যন্ত সম্ভব হয় না, প্রতিবেশীদের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছে। এক তরুণী মায়ের সাথে, যখন পুলিশের হাতে তার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, তখন কাঠের ভাঙাচোরা বাড়ির এক রুমের ঘরে তার স্বজনরা পাশেই শুয়ে ছিল। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে ঘরে কোন রেফ্রিজারেটর না থাকায় সেই তরুণী মা তার শিশুর দুধের বোতল বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছিলেন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যে ৩৩টি মাদক সম্পর্কিত খুনের তথ্য নথিভুক্ত করেছে, তার মধ্যে ২০ জনেরও বেশি পুরুষের স্ত্রী ও সন্তান ছিল–যেসব সন্তানের অনেকেই বেশ কম বয়সী। প্রধান অর্থ উপার্জনকারীকে হারিয়ে পরিবারগুলোর আর্থিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। এর সাথে যোগ হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বাড়তি খরচ। এফরেন মোরিলো পুলিশি অভিযানে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে বেঁচে গেলেও তার ১০ দিন হাসপাতালে থাকার খরচ মেটাতে তার পিতাকে তাদের বাড়িটি বিক্রি করতে হয়েছিল। কিদাপাওয়ান সিটিতে অজানা ব্যক্তিদের গুলিতে আহত হয়ে রিকেন সিংসন হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আইসিইউতে ২৮ দিন কোমার মধ্যে থেকে মারা যায়। তার পরিবারের এক সদস্যের মনে আছে, “হাসপাতালের বিল দিতে হয়েছিল প্রায় ৪ লক্ষ পেসো (৮,০৫৫ ইউএস ডলার)। হাসপাতালের কাছে জমি বন্ধক রেখে লাশ আনতে হয়েছিল।”

মাদক সম্পর্কিত হত্যাকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিদের স্বজনরা অনেক সময় তাদের প্রিয় মানুষটির মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের সংকটের কথা উলেখ করে। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকেও দেখা যায়, খুদে বিক্রেতারা জীবিকা অর্জনের জন্যই মাদক ব্যবসা করছে। ক্রিসোসতমো ডায়াজের স্ত্রী নিলি বলেছেন, সে ‘রানার’ বা পরিবহনকারী হিসেবে মাদক বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করত। “তার কারণ আমাদের আর কোন উপায় ছিল না”, তিনি যোগ করেন। কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কথা শুনে ডায়াজ আত্মসমর্পণ করেছিলেন, মাদক ব্যবহার ছেড়েও দিয়েছিলেন; কিন্তু কোন কর্মসংস্থান তাঁর জোটেনি, তার বদলে ১৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাঁর বাসায় তাঁকে হত্যা করে।

সেবু প্রদেশে ৪৯ বছর বয়সের যে নারীকে হত্যা করতে গিয়ে পুলিশ আরেকজনকে খুন করে ফেলে, তাঁর ছেলে স্বীকার করে যে তার মা শাবু (ইয়াবা) বিক্রি করে। সে বিষয়টা এভাবে ব্যাখ্যা করে, “তিনি এক জায়গা থেকে শাবু কিনে আরেক জায়গায় বিক্রি করে মুনাফা করতেন। আমার বাবা জেলে আছেন বলেই তিনি এই কাজের মাধ্যমে আমাদের খাবার জোগাড় করতেন।” তার মা মাত্র প্রথম গ্রেড পাস করেছেন, তাই তাঁর অন্য কোন কর্ম জোটেনি। তার মনে পড়ে, “পুলিশ অভিযানের আগে [যে অভিযানে মায়ের জেল হয়] আমরা মাকে এই কাজ ছেড়ে দিতে বলেছি। কিন্তু তিনি বলেছেন, ‘তাহলে তোমাদের খাওয়ার অর্থ কোথা থেকে পাব? আর আমি তো কেবল খুচরা বিক্রির সাথে যুক্ত’।”

সাক্ষাৎকারে নাগরিক অধিকার কর্মী ও পরিবারের সদস্যরা বারবারই বলেছেন যে এই ‘মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ আসলে ‘গরিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ বা ‘দরিদ্র্য বিরোধী’। ফ্লোরজন ক্রুজের স্ত্রী রিতা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেন, পুলিশ তাঁর স্বামীকে বিক্রেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কিন্তু তিনি তো তেমন বিত্তশালী নন। তাঁর প্রশ্ন, “[প্রেসিডেন্ট দুতার্তে] কেন শুধু চুনোপুঁটিদের টার্গেট করছেন? কেন তাদের আরেকটা সুযোগ দেয়া হচ্ছে না? যারা খুন হচ্ছে তাদের পরিবারগুলো কিভাবে চলবে?” ২০১৬ সালের ৩১ অক্টোবর অজানা ব্যক্তিদের হামলায় নিহত পাওলো টুবোরোর এক স্বজন একইভাবে বললেন, “এটা আসলেই অন্যায্য। বড় বড় বিক্রেতার কোন সমস্যা হচ্ছে না। চুনোপুঁটিরা তো স্রেফ জীবিকার তাগিদে, তাদের সন্তানদের মুখে খাবার জোগাতে... ...এর সাথে যুক্ত হয়েছে। আপনি বড় বিক্রেতা হলে আপনার কিছুই হবে না, কিন্তু গরিব হলে খুন করা হবে।”

মাদক সম্পর্কিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত এমন দুজন ভাড়াটে খুনি অ্যামনেস্টির কাছে স্বীকার করেছেন, দরিদ্ররাই তাদের মূল লক্ষ্য। দশ বছর ধরে ভাড়াটে খুনি হিসেবে কাজ করছেন ৪৭ বছর বয়সী এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, “হাই প্রোফাইল কেইস একটাও ঘটেনি। আমরা ওই ধরনের কোন মানুষকে খুন করিনি। কেউই করেনি।” একই

গ্রুপের এক নারী সদস্যও বললেন, "আমাদের কাজ সাধারণত দরিদ্র এলাকাগুলোতে। কারণ আত্মসমর্পণকারীরা সব ওই সব এলাকায়ই থাকে। বড় বিক্রেতা ও ড্রাগ লর্ডরা তো আর আত্মসমর্পণ করে না।" মাদকবিরোধী ইউনিটের এক পুলিশ কর্মকর্তাও এই পার্থক্যের কারণে হতাশা প্রকাশ করে বললেন, "মাদক যুদ্ধের সমস্যা হল কোন রাজনীতিবিদ বা ধনী মানুষকে [টার্গেট করা হচ্ছে না], এমনকি [মাদক ব্যবসার পক্ষে কাজ করার জন্য] যে পুলিশদের হত্যা করা হচ্ছে তারাও ছোটখাট মানুষ, কোন বড়কর্তা নয়।"

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ফিলিপাইন কর্তৃপক্ষ ১২ কোটি ডলার বা ৮৪০ কোটি টাকা মূল্যের ২ হাজার পাউন্ড মেথামফেটামিন বা ইয়াবা উদ্ধারের দাবি করে। ফিলিপাইনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মাদক উদ্ধারের এই ঘটনা ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের চার মাসব্যাপী অভিযানের ফল, যে ঘটনাটিকে বৃহদাকার মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় সফলতা বলে প্রশংসা করা হয়। কিন্তু এই ঘটনার বিস্তারিত খতিয়ে দেখলে ফিলিপাইনের পুলিশের কোন ধরনের হত্যাকাণ্ড না ঘটিয়েই মাদক অপরাধীদের গ্রেপ্তারসহ অভিযান পরিচালনার ধরন ও সামর্থ্যের বিষয়টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে: নগরের বস্তি এলাকাগুলোতে ছোট ছোট মাদক বিক্রেতাকে প্রতিদিন হত্যা করার ঘটনার বিপরীতে আমরা দেখব ডিসেম্বর মাসের বড় আকারের মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে তিনজন আবার চীনা নাগরিক। এই গ্রেপ্তারকৃতরা এখন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, যে সুযোগ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নথিভুক্ত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার দরিদ্র ব্যক্তিরা কখনও পাননি।

কয়েক সপ্তাহ আগে এক নারী, যাঁর ৩৮ বছর বয়সী স্বামী মেট্রো ম্যানিলা বস্তি এলাকায় পুলিশি অভিযানে নিহত হয়েছেন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেছিলেন তাঁর এলাকায় আরও বহু মানুষ খুন হয়েছে। তিনি বলেছেন, "ধনীদের জেলে নিয়ে সাক্ষী বানানো হয়েছে। কেন শুধু গরিবরাই খুন হচ্ছে? আমাদের এলাকায় তাদেরই মারা হচ্ছে যাদের পরিবার রয়েছে–যারা সামান্য কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য মাদক বিক্রি করে। তাদের জীবিকার অন্য উপায় থাকলে তো তারা [মাদক বিক্রি] করত না।"

[লেখাটি ফিলিপাইনের মাদক যুদ্ধের ওপর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তদন্ত প্রতিবেদন "If you are poor, you are killed": Extrajudicial Executions in the Philippines' "War on Drugs (2017)"-এর "War on the Poor" শীর্ষক অনুচ্ছেদের অনুবাদ।]

'থাইল্যান্ডের মাদকের বিরুদ্ধে ব্যর্থ যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা'

মাদক পাচারের গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট হওয়ার কারণে ১৯৫০-এর দশক থেকেই থাইল্যান্ডে মাদকের বহুল ব্যবহার হয়। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকের দিকে মেথামফিটামিনস (থাইল্যান্ডে যা ইয়াবা নামে পরিচিত) এর ব্যবহার থাইল্যান্ডের শাসকদের চিন্তিত করে তোলে।

বার্মিজ বিদ্রোহীরা তাদের সশস্ত্র যুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের জন্য থাইল্যান্ড-মিয়ানমার সীমান্তে ইয়াবা উৎপাদন করত। কিন্তু দামে সস্তা হওয়ার কারণে এই ইয়াবার ভোক্তা ছিল থাইল্যান্ডের গ্রামীণ শ্রমিক শ্রেণি।

গণমাধ্যমে তরুণদের ক্রমবর্ধমান ইয়াবা আসক্তির খবর আসতে থাকলে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিরা, বিশেষত থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল ও তাঁর প্রিভি কাউন্সিল এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

থাকসিন সিনাওয়াত্রা, একসময়কার লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ইয়াবার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মাদক ব্যবসায়ীদের দেশের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তিন মাসে আড়াই হাজার হত্যাকাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী থাকসিন বিজয় ঘোষণা করেন।

থাকসিনের মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য স্থানীয় গভর্নর ও পুলিশ অফিসারদের সহায়তা নেয়া হয়। সরকারি কর্মকর্তারা 'কালো তালিকা' তৈরি করত, যে তালিকা ধরে ধরে গ্রেপ্তার এবং অনেক ক্ষেত্রে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালানো হত। লাশের স্তূপ বাড়তে থাকলে পুলিশ দাবি করে–বেশির ভাগ মৃত্যু পরস্পরবিরোধী গ্রুপের দ্বন্দ্বের কারণে ঘটেছে।

পুলিশের ওপর সাফল্য দেখানোর চাপ ছিল, যে সাফল্যের মাপকাঠি ছিল লাশের সংখ্যা। এর ফলে বিদ্যমান হায়ারার্কি আরও মজবুত হল, দুর্নীতি বেড়ে গেল এবং মাদক বাণিজ্যে সহায়তাও বাড়ল।

পুলিশ সাধারণত মাদক নেটওয়ার্কের 'ছোট মাছ'দেরই টার্গেট করত, যেমন–নিচের স্তরের ডিলার কিংবা পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামবাসী। তালিকায় বড় ড্রাগ লর্ডদের নাম খুব কমই থাকত, কিন্তু প্রতিটি মৃত্যুকেই সফলতার দিকে পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হত।

২০০৬ সালের সামরিক ক্যুর পর পরিচালিত এক সরকারি তদন্ত থেকে দেখা যায়, মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ হিসেবে যে ২,৫০০ মানুষকে খুন করা হয়েছিল তার মধ্যে ১,৪০০ মানুষেরই মাদকের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। শুধু তা-ই নয়, মিয়ানমার ও থাই সরকারের আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় মিয়ানমার থেকে মাদক চোরাচালানের রুটও অক্ষত আছে বলে জানা যায়।

থাইল্যান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বিচারবহির্ভূত প্রক্রিয়ায় মাদক নিরাময় করতে চাইলে মাদক পিরামিডের উঁচুতে থাকা ব্যক্তিরা দায়মুক্তি পেয়ে যায়। হাজার হাজার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কলম্বিয়া ও মেক্সিকোও কয়েক দশক আগে এই সত্য উপলব্ধি করে।

[লেখাটি থাইল্যান্ডের থামাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক Janjira Sombatpoonsiri এবং ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপিনসের শিক্ষক Aries Arugaz এর লেখা Duterte's war on drugs: bitter lessons from Thailand's failed campaign এর আংশিক অনুবাদ।]

কলম্বিয়া: প্রেসিডেন্টের তিক্ত উপলব্ধি

অবৈধ মাদক জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার, কিন্তু শুধু সামরিক আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতা যায় না। মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে আরও বেশি করে সেনা আর পুলিশ লেলিয়ে দিলে শুধু যে অর্থের অপচয়ই হয় তা-ই নয়, সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অহিংস আইন ভঙ্গকারী আর মাদকসেবীদের জেলে পুরলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয়, সংগঠিত অপরাধীচক্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এই বার্তাটিই আমি সারা দুনিয়া এবং বিশেষত ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রডরিগো দুতার্তেকে জানাতে চাই। বিশ্বাস করুন, অনেক ভোগান্তির মধ্য দিয়ে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে।

আমরা কলম্বিয়ানরা মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই সম্পর্কে কিছু না কিছু

তো জানি। বহু বছর ধরেই আমাদের দেশটি বিশ্বের প্রধান কোকেন সরবরাহকারী। মাদক উচ্ছেদ ও মাদকের কার্টেল ধ্বংস করার জন্য উত্তর আমিরকা ও পশ্চিম ইউরোপের সরকারগুলোর সহযোগিতায় আমরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছি। ১৯৯৩ সালে দুনিয়ার সবচেয়ে খতরনাক মাদক পাচারকারী পাবলো এসকোবারকে ঘায়েল করার কাজে আমি ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত ছিলাম। এর মধ্য দিয়ে আমরা কলম্বিয়াকে কিছুটা নিরাপদ করতে পারলেও এর জন্য মারাত্মক খেসারত দিতে হয়েছিল।

আমার সরকারসহ প্রতিটি সরকারই সমস্যার সমাধানের জন্য বহু কিছু করেছে–ফসলের খেতে স্প্রে করা থেকে শুরু করে মাদক বিক্রেতাকে দেখা মাত্রই জেলে দেয়া। এর ফলে শুধু যে কলম্বিয়ায় মাদক উৎপাদন, চোরাচালান ও ব্যবহার বন্ধ করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি তা-ই নয়, সেই সাথে পার্শ্ববর্তী দেশে মাদক ও অপরাধ ছড়িয়ে দিয়েছি। আরও নতুন নতুন সমস্যাও তৈরি করেছি। আমাদের মাদকবিরোধী যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে। আমাদের মেধাবী রাজনীতিবিদ, জজ, পুলিশ অফিসার আর সাংবাদিকরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। সেই সাথে মাদকচক্রের অর্জিত বিপুল অর্থে সরকারের নির্বাহী, বিচার ও আইন বিভাগ আরও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে।

মাদকের বিরুদ্ধে এই অতি কঠোর পদক্ষেপের ফলে কলম্বিয়া কিংবা ইউরোপ-আমেরিকায় মাদকের চাহিদা ও সরবরাহ সামান্যই হ্রাস পেয়েছে। বস্তুত কোকেন কিংবা হেরোইনের মত মাদকদ্রব্য আগের যে কোন সময়ের মতই বোগোতা থেকে নিউ ইয়র্ক কিংবা ম্যানিলায় সহজলভ্য।

মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মূলত জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু বহু দেশ এখনও মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেশায় আক্রান্ত। কলম্বিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়াল সান্তোস যেমন বলেছেন : "এখনও আমরা গত ৪০ বছরের পুরনো চিন্তাকাঠামোর মধ্যেই ভাবছি।" সৌভাগ্যক্রমে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো ক্রমশ নতুন নতুন উপায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে, যার মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও স্বাস্থ্যসেবা অক্ষুণ্ন রেখেই মাদক বিক্রির মুনাফা কেড়ে নেয়া সম্ভব হবে।

তাহলে আমাদের প্রস্তাবটি ঠিক কী? আসলে আমরা বিশ্বাস করি না যে সামরিক সরঞ্জাম, পুলিশি নিপীড়ন আর বড় বড় জেলখানার মাধ্যমে মাদক সমস্যার সমাধান করা যাবে। জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নয়ন, দুর্নীতি, বিশেষত অর্থপাচারবিরোধী পদক্ষেপ আরও শক্তিশালীকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে মাদকের চাহিদা ও সরবরাহ কমানো যেতে পারে।

[লেখাটি কলম্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট সিজার গ্যাভিরিয়ার লেখা President Duterte Is Repeating My Mistakes শীর্ষক লেখার আংশিক অনুবাদ। লেখাটি গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়।]

গ্রন্থনা (ও অনুবাদ): কল্লোল মোস্তফা

সংগ্রহ: ঠাট্টা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭মে ২০১৮